ইরিনা রাকশা
বেড়াবার মতো বেড়ানো
প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইবেরীয় তাইগায় বিশ শতকের বিরাট নির্মাণকর্মটা কী ব্যাপার?

কী ধরনের যন্ত্র সেখানে  কাজ করছে?

উত্তরের হরিণ কী খায়?

নদীর ওপর সেতু বাঁধা হয় কিভাবে?
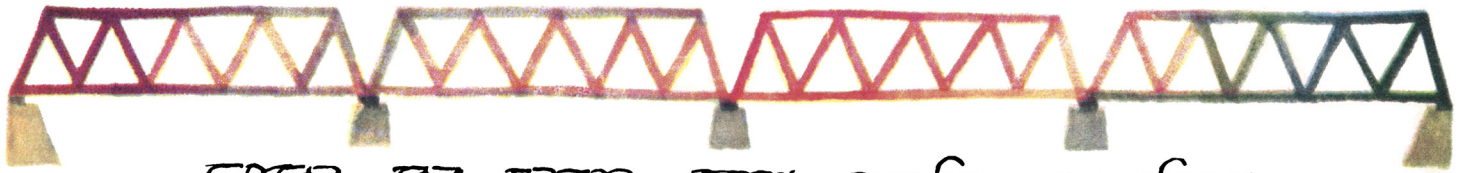
লোকের কেন দরকার লোহা আকরিক, অ্যালুমিনা, পাথুরে কয়লা, টাঙ্গস্টেন?

সাইবেরিয়ার তাইগায় কি ধরনের গাছ, ফুল, বেঁচি আর ব্যাঙের ছাতা জন্মায়?

সাইবেরিয়ায় কি ভালুক, কাঠবেড়ালি, বনবিড়াল এবং অন্যান্য জন্তুজানোয়ার আছে?

এইসব নানা বিচিত্র খবর পাওয়া যাবে  বইটিতে।
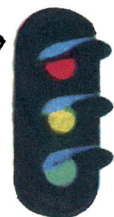
ইরিনা রাকশা

# বেড়াবার মতো বেড়ানো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: এ. স. জারিয়ানস্কি

**পাঠকদের প্রতি**

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:


প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union



আলেক্সান্দর মারশানি

আলেক্সেই ফ্রেইড্‌বার্গ

ইয়েভ্‌গেনি পজার্‌স্কি

ইজ্‌মাইল মুখিন প্রভৃতি

শিল্পী: এদুয়ার্দ জারিয়ান্‌স্কি

আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পেতিয়ার, উদ্বেগে চোখ মেললে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু মনে পড়ে যাওয়ায় শান্ত হয়ে গেল। বলতে কি খুশিই লাগল তার। সে যে বিমানে করে যাচ্ছে! সত্যিকারের বড়ো একটা বিমানে সে উড়ছে জীবনে এই প্রথম বার। বিমানে এমন অসাধারণ ভ্রমণ, তাও অত দূরে, সে তো আর আটবছুরে সবার ভাগ্যে হয় না। কাচের ওপাশে সমান তালে নিশ্চিন্তে গোঁ-গোঁ করে চলেছে ইঞ্জিন, তাজা বাতাসের একটা ধারা ছুঁয়ে যাচ্ছে পেতিয়ার ছাঁটা মাথা, তার ছুলি ভরা মুখখানা। বেশ লাগছে তাতে, তৃপ্তিতে নীল চোখ কোঁচকাল ছেলেটা। পাশেই বসে খবরের কাগজ পড়ছে পেতিয়ার বাবা। পেতিয়া দেখতে তার বাবার মতোই, শুধু সে ছোটো আর বাবা বড়ো, রোদ পোড়া পেশল হাত, রোদ পোড়া মুখ। বাবা মেকানিক, যন্ত্র চালায়। আর যাচ্ছে তারা সাইবেরিয়ায়, পেতিয়ার বাবার নতুন কাজের জায়গায়। যাচ্ছে রেলপথ বানাতে। রাস্তা বানাবে অবিশ্যি বাবা। কিন্তু পেতিয়া?.. পেতিয়া তাকে সাহায্য করবে। নিজেও তো সে তার খেলনা ট্র্যাক্টর, বুলডোজার, টিপ-আপ লরি চালাতে পারে, গাড়ির মার্কাগুলো তার মুখস্থ। কিন্তু সাইবেরিয়া কী সেটা পেতিয়ার জানা নেই এখনো। কী যে ইচ্ছে হচ্ছে তাড়াতাড়ি জেনে নেবার! তাড়াতাড়ি করে দেখার! আর কী চমৎকার যে যাচ্ছে বিমানে করে। যদি

ট্রেনে করে যেত, তাহলে গোটা দেশ পেরিয়ে পৌঁছতে লাগত পুরো চার দিন। আর বিমানে তারা এই পথটাই পাড়ি দেবে চার ঘণ্টায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা উড়বে উঁচু উঁচু পাহাড়, সবুজ বন, নীল নীল নদী আর হ্রদের ওপর দিয়ে যাদের পার দেখা যাবে না। এতটাই বড়ো দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে থাকে পেতিয়া খোকা!

পেতিয়ার জন্ম শহরে। সবচেয়ে বড়ো আর সুন্দর, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রধান শহর মস্কোয়। থাকত তারা উঁচু একটা পাকা বাড়িতে, সবার ওপরকার আট তলায়। স্কোয়ারে পেতিয়া খেলে বেড়াত শক্ত বালিঢালা পথে, পীচবাঁধানো ফুটপাথে।

তাই পেতিয়া আর বাবার জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে মা খুশি হয়েই বললে: 'ওখানে আমাদের পেতিয়া দিব্যি অবাধে ছুটে বেড়াতে পারবে মাঠে ঘাটে।'

তখন গরমকাল, কিন্তু কেন জানি মা স্যুটকেসে চাপাতে লাগল গরম জিনিসপত্র।

পেতিয়াকে সে বললে: 'সন্ধেগুলোয় ঠাণ্ডা পড়বে, তাই গরম জামাকাপড় পরবি। যতই হোক বারোমেসে হিম-জমা,' — বলে স্যুটকেসে রাখল পেতিয়ার লাল সোয়েটার আর নতুন নীল টুপিটা।

'কিন্তু বারোমেসে হিম কী জিনিস?' সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল পেতিয়া।

পেতিয়ার বাবা সাইবেরিয়ায় গেছে বেশ কয়েক বার। সে শুধু হেঁয়ালি করে হাসল।

'এই তো নিজেই দেখবি।'

বন্দরে বিমানে ওঠার আগে পেতিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে দেখতে লাগল উড্ডয়নের ধূসর মাঠ, একেবারে সত্যিকারের মস্তো এক রুপোলী বিমান, ঠাহর করার চেষ্টা করছিল ঠিক কোন বিমানটায় সে যাবে। মা ওদিকে বেশ গুরুগম্ভীর হয়েই বলছিল:

'তোমরা ওখানে ভালো করে বৈ.আ.রে বানিও। ও পথটার গুরুত্ব আছে। তোমাদের কাজের ওপর নজর রাখবে সারা দেশ,' হাসল মা, 'আমিও নজর রাখব বৈকি, তোমাদের নিয়ে গর্ব করব আমি, চিঠি লিখব।' বিদায়কালে বাবা আর পেতিয়াকে চুমু খেয়ে মা যোগ করলে: 'শরতে আমিও যাব, নতুন স্কুলে ভর্তি করে দেব পেতিয়াকে।'

'বৈ.আ.রে কী জিনিস?' এদিক ওদিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে পেতিয়া।

কিন্তু ওর কথার জবাব দেবার সময় হল না কারো। বিমানে আসন নেবার ঘোষণা হল মাইকে, তাড়াতাড়ি করে পেতিয়া ও বাবা বেরিয়ে এল উড্ডয়নের মাঠে, তারপর উঠল বিমানে। আর মা রইল কাচের দেয়ালের পেছনে, কেবলি হাত নাড়ছিল সে, শাদা রুমাল চেপে ধরছিল চোখে।

তারপর বাবার সঙ্গে সে এখন বিমানে করে যাচ্ছে। বিমানে যাত্রী প্রচুর। সবাই তারা পেতিয়ার মতো বসে আছে নরম কেদারায়। পেতিয়া বসেছে জানলার কাছে। অনেক জানলা বিমানে, প্রতি সারি কেদারার ডাইনে বাঁয়ে জানলা আর সবই গোল গোল। এমন জানলা পেতিয়া দেখছে এই প্রথম। জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে দেখল জ্বলজ্বলে সূর্য, প্রকাণ্ড আর চোখ-ধাঁধানো, যেন একেবারে কাছেই, হাত বাড়িয়ে যেন ছোঁয়া যায়, তবে চট করেই তুলে নিতে হবে হাত, নইলে পুড়ে যেতে তো পারে।

নিচের দিকে তাকায় পেতিয়া, আর নিচে কেবল সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বলে শাদা শাদা বরফের স্তূপের মতো মেঘ। মাটির চিহ্ন নেই।

'কী এটা?' অবাক লাগে পেতিয়ার।

কাগজ খস্‌খস্‌ করে বাবা চকিতে তাকায় জানলার দিকে; বুঝিয়ে বলে: 'এগুলো মেঘ, মাটি আড়ালে পড়েছে তাতে। তবে হয়ত কেটে যাবে, কিছু না কিছু দেখতে পাব।'

'তার মানে আমরা মেঘের ওপর দিয়ে উড়ছি!' পেতিয়া বিশ্বাস করবে কি করবে না, ভেবে পায় না।

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ে বাবা, 'আর জানিস, জানলার বাইরে এখন কী রকম ঠাণ্ডা, একেবারে শীতকালের মতো, যদিও নিচের মাটিতে গ্রীষ্মকাল।'

পেতিয়া ভাবে: 'দ্যাখো কী উঁচু! পাখিরাও এতদূর উড়ে আসতে পারে না।' কিন্তু কেন জানি, ভয় করছে না তার। পাশেই যে রয়েছে বাবা, তাড়াহুড়ো করে তারা যাচ্ছে সাইবেরিয়ায়, খুব জরুরী একটা কাজে, রেলপথ বানাবে, বৈ.আ.রে বানাবে।

'কিন্তু বৈ.আ.রে কী?' বাপের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

বাবা বলে: 'সাইবেরিয়ায় আমাদের যে রেলপথটা পাততে হবে, এটা তার নাম: বৈকাল-আমুর রেলপথ, যদি শব্দগুলোর আদ্যক্ষর পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে দাঁড়ায় বৈ.আ.রে।'

ইঞ্জিনের সমতাল গুঞ্জন শুনতে শুনতে একটুখানি চুপ করে রইল পেতিয়া, কিন্তু আবার মুখ ফেরাল বাবার দিকে:

'কিন্তু কেন অমন নাম?'

ওপর থেকে বাবা কটাক্ষে চেয়ে দেখল ছেলেকে, তার বেয়াড়া মাথা, কপালের ওপর হালকা রঙের চুলগুলোর দিকে।

'এখন বুঝতে পারছি মা কেন তোকে বলে "কী-কেন-টা"।'

কিন্তু পেতিয়া প্রবল আপত্তি জানাল:

'তুমি নিজেই তো বলেছিল, কিছু বুঝতে না পারলে সর্বদাই জিজ্ঞেস করবে।'

মুচকি হাসল বাবা।

'তা ঠিক,' বলে কাগজ গুটিয়ে রাখল, 'তবে বৈ.আ.রে-র

АЭРО
ФЛОТ

কথা বলে তোকে যদি ভালো করে বোঝতে হয়, তাহলে দরকার কাগজ।' কোটের পকেট থেকে নিজের নোটবইটা বার করল বাবা, 'আরো দরকার রঙীন পেনসিল। শুধু পেনসিল আমার কাছে নেই। তোর পেনসিলগুলো রয়েছে স্যুটকেসে, আমাদের সঙ্গে তারা চলছে বৈ.আ.রে-তে। তবে কলম আছে আমার।' পকেট থেকে রঙের বল-পয়েণ্ট বের করল বাবা। তারপর নোটবইয়ের একটা শাদা পাতা খুলে বাবা পেতিয়ার দিকে ঝুঁকে এল: 'আমি আঁকতে আঁকতে বলে যাব, তুই শুনতে শুনতে দেখবি। বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই আছে এক মহাবীর নিয়ে কাহিনী, যে পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে খুঁজছে গুপ্তধন। খুঁজে বার করতে শক্তি লাগবে অনেক, দুঃসাহসী কাজ করতে হবে কম নয়। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে বার করে খুঁড়ে তুলে মহাবীর যদি তা লোকেদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়, তাহলে তাদের দিন কাটবে ভালোভাবে, সুখেস্বচ্ছন্দে। এমন একটা কাহিনী রুশী জনগণের মধ্যেও চালু আছে। কিন্তু জানিস খোকা,' পেতিয়ার নীল চোখের দিকে বাবা তাকাল গুরুগম্ভীর ভাব করে, 'সোভিয়েত দেশে সে কাহিনী ফলে যাবার কথা। সত্যি হয়ে যাচ্ছে তা। ভেবে দ্যাখ, ভূতাত্ত্বিক, মোটেই মহাবীর নয়, নিতান্ত সাধারণ লোক, তারা খুঁজে পেয়েছে আশ্চর্য সব ধন, প্রকৃতি তা মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। আর এমন ধনাগার কেবল একটা নয়, কয়েকটা, খুব সম্ভব অনেকগুলো। এসব ধনাগারে অবিশ্যি টাকা নেই, কিন্তু আছে নানা ধাতুর আকরিক, তা থেকে বানানো যায় মেসিন-টুল, ট্র্যাক্টর, যন্ত্র, বিমান, রকেট। বুঝেছিস কী দরকারী জিনিস! কিন্তু এই যে আকরিক, দেখতে যা নিতান্ত অসুন্দর পাথরের মতো, তা লুকানো আছে অনেক দূরে। সত্যি করেই পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে, সাইবেরিয়ায় আর দূর প্রাচ্যে।' — এই বলে বাবা বল-পয়েণ্ট টিপে সবুজ রঙে আঁকল সাইবেরিয়া আর দূর প্রাচ্যের আঁকাবাঁকা রূপরেখা। তারপর নিখুঁতভাবে গোটাটা সবুজ আঁচড়ে ভরে তুলল, কেননা সত্যিই এই গোটা জায়গাটা ঘন সবুজ বন, তাইগা'য় ঢাকা।

'এবার আমাদের ম্যাপে এইসব ধনাগারগুলোয় লাল তারার চিহ্ন দিয়ে রাখি, এদের বলা যাক দামী খনি। যেমন অ্যালুমিনিয়ম যা দিয়ে আমাদের বিমানটা তৈরি, টাঙ্গস্টেন — যা দিয়ে বানানো হয়েছে এই ছোট্ট বিজলী বাতিটার তার। এমনি আরো অনেক।'

সবুজ পটের ওপর লাল রঙে কয়েকটা তারা আঁকল বাবা।

'কিন্তু নদী কোথায়?' ম্যাপের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে পেতিয়া।

'দাঁড়া, দাঁড়া,' আবার বল-পয়েণ্ট টিপে সবুজ পটের ওপর নীল কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা টানল বাবা, 'এই হল তোর নদী। কিন্তু এগুলো শুধু বড়ো বড়ো, সবচেয়ে প্রধান নদী: আঙ্গারা, লেনা, জেয়া, ভেরেয়া, আমুর। আমাদের এই ছোট্ট কাগজটায় ছোটো ছোটো নদীর ঠাঁই হবে না। তেমন নদী যে ওখানে তিন হাজারেরও বেশি। আর এইটে, ডান দিকের শেষ নদীটা হল আমুর। তা গিয়ে পড়েছে মহাসাগরে, তার নাম প্রশান্ত মহাসাগর, যদিও মোটেই তা তেমন শান্ত নয়।'

'কেন?'

লেনা নদী
ভিতিম নদী
ওলেকমা নদী
উস্ত্-কুত
নিজনেআঙ্গার্স্ক
উদোকান
চারা
বৈকাল
ইরকুৎস্ক
চিতা

চুলমান
বেরকাকিত
অখোৎস্কয়ে সাগর
তিন্দা
সেলেমজিনস্ক
আমুর তীরের
কমসোমলস্ক
জেয়া নদী
বুরেয়া নদী
উরগাল
বেরেজোভায়া
বৈ. আ. রে
আমুর নদী

'প্রায়ই ঝড় ওঠে তাতে। ঢেউ তখন হয়ে দাঁড়ায় বাড়ি সমান উ'চু,' বলে নীল রঙের আঁচড়ে বাবা ভরে তুলল মহাসাগর, এমনকি ঢেউও আঁকল তাতে, ঢেউয়ের ওপর ছোট্ট জাহাজ।

জাহাজটা খুবই মনে ধরল পেতিয়ার। সেটা সে দেখতে লাগল তাকিয়ে, এমনকি আঙুল দিয়ে ছুঁয়েও নিল। কিন্তু বাবা বলে চলল:

'এই ধন পেতে হলে, বড়ো বড়ো নদী, গহন বন, উ'চু উ'চু পাহাড় পেরতে হলে,' নদীগুলোর মাঝে মাঝে পাহাড় আঁকল বাবা, 'এই ধন খুঁড়ে লোককে দিতে হলে দরকার পথ। মনে রাখিস পেতিয়া, সেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, — খুব দরকার রেলপথ।'

পেতিয়া কী ভাবল, বাবার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে:

'কিন্তু সাইবেরিয়ায় তো একটা রেললাইন আছে। তুমি আর মা তো বলাবলি করছিলে তোমার নতুন কাজের জায়গায় কিসে যাওয়া ভালো, রেলে নাকি হাওয়াই জাহাজে।'

ছেলের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে হাসল বাবা:

'তুই ঠিক বলেছিস। সাইবেরিয়ায় রেললাইন আছে একটা। মস্কো থেকে তা গেছে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। আমাদের ম্যাপে সেটাও আঁকতে হয় তাহলে।' কালো রঙে রেললাইন আঁকল বাবা, 'এবার দ্যাখ। আমাদের গুপ্তধন এই রেললাইন থেকে কত দূরে দেখতে পাচ্ছিস?'

'সত্যিই অনেক দূরে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেতিয়া, 'ওখানে পে'ছিনো যাবে না। পথ গেছে পাশ দিয়ে।'

'এইবার আমরা এসেছি প্রধান কথাটায়,' বলে জ্বলজ্বলে লাল রঙে সবুজ পটের ওপর বাঁ থেকে ডাইনে বাবা ভাঙা ভাঙা লাইন আঁকল একেবারে নীল মহাসাগর পর্যন্ত, যেখানে ঢেউয়ে দুলছে জাহাজটা।

'এই হল সেই পথ যা আমাদের ভারি দরকার — বৈকাল-আমুর রেলপথ,' লাইন গেছে তারাগুলোর একেবারে কাছ দিয়ে, বাবা যা এ'কেছিল তেমন সবকটি নদী, সবকটি পাহাড় ভেদ করে।

খুশি হয়ে উঠল পেতিয়া, 'বটেই তো, এ তো একেবারে কাছে। গিয়ে যা দরকার নিলেই হল।'

কিন্তু আপত্তি জানাল বাবা:

'কিন্তু এ পথটা বানানো এখনো বাকি আছে। অনেক মুশকিলের আসান করতে হবে। যেমন, সেতু বানাতে হবে সমস্ত নদীর ওপর দিয়ে। আর তোকে তো বলেইছি, সংখ্যায় সেগুলো তিন হাজারের বেশি।'

পেতিয়া অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা তুলল:

অতগুলো সেতু বানাতে হবে?'

'হ্যাঁ। তবে শুধু সেতুই নয়। জলাগুলোয় বাঁধ-রাস্তা বানাতে হবে মাটি ফেলে। উড়িয়ে দিতে হবে ছোটোখাটো পাহাড়। বড়োগুলোর ভেতর দিয়ে খুঁড়তে হবে সুরঙ্গ আর রেললাইন পাততে হবে লম্বায় তিন হাজার কিলোমিটার।'

'মহাসাগর পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, মহাসাগর পর্যন্ত। তাছাড়া,' যোগ দিল বাবা, 'এসব জায়গায় বসাতে হবে শহর আর বসতি, থাকবে তাতে নির্মাতা, সন্ধানকারী, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ররা।'

'ছেলেপুলেরাও থাকবে?'

'নিশ্চয়, তারাও থাকবে বৈকি, তোরই মতো সব ছেলেমেয়েরা। বানাতে হবে ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল আর যত পারা যায় তাড়াতাড়ি। বৈ.আ.রে যারা বানাচ্ছে এত কাজ তাদের ঘাড়ে,' — উপসংহার টেনে বললে বাবা।

চুপ করে রইল পেতিয়া। তারপর তার পরিষ্কার চোখ মেলে শুধাল:

'কিন্তু তাহলেও রাস্তাটার এই নাম কেন বাবা?'

বাবা সখেদে নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর তার আঁকা ছবিটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল:

'আরে দাঁড়া! আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম!' এই বলে সবুজ তাইগার মাঝখানে তাড়াতাড়ি করে আঁকল একটা বড়োমতো নীল অর্ধচন্দ্র, 'এইবার মনে হয় সবই ঠিক আছে।'

'এটা কী?' নীল অর্ধচন্দ্রটার দিকে সকৌতূহলে তাকাল পেতিয়া।

'এটা হ্রদ রে। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গভীর হ্রদ। ভারি সুন্দর দেখতে, আর ঠাণ্ডা। অনেক মাছ আছে তাতে, সাগরের মতো সীলমাছও আছে। এর নাম হল বৈকাল। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে বৈকাল-আমুর রেলপথ।'

পেতিয়া আঙুল দিয়ে দেখাল, 'এখান থেকে তা শুরু হচ্ছে, তারপর যাচ্ছে আমুর নদী, তারপর আরো এগিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত,' লাল রেখাটা বরাবর আঙুল বুলিয়ে নিল পেতিয়া।

'ঠিক কথা, এবার সবটা বুঝলি তো,' খুশি হয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিল বাবা। ভেবেছিল আবার খবরের কাগজটা টেনে নেবে কিন্তু ফের পেতিয়ার চোখে জিজ্ঞাসা:

'আচ্ছা বাবা, কোথায় আমরা যাচ্ছি?'

তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করল বাবা।

'তুই তো ভালোই জানিস, যাচ্ছি বৈ.আ.রে-তে।'

'আঃ, সে কথা নয়,' বিরক্ত হয়ে মাথা নোয়াল পেতিয়া, 'মানে কোথায় আমরা যাচ্ছি?' ম্যাপে আঙুল ঠেকাল সে, 'তুমি নিজেই তো বললে পথটা ভারি লম্বা, তিন হাজার কিলোমিটার।'

'ও, এইবার বুঝেছি,' এই বলে নোটবইটা নিয়ে বাবা ছবিটার মাঝামাঝি আঁকল দুটি মজার মূর্তি — একটি ছোটো, একটি বড়ো। লাল রেখাটার ওপর হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'এটা তুমি আর আমি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল পেতিয়া।

বাবা হেসে বললে:

'এইখানটায় চলেছি আমরা, বৈ.আ.রে-র মাঝখানকার প্লটটায়। মনে হয় এক ঘণ্টার মধ্যেই বিমান নামতে শুরু করবে। তারপর হেলিকপ্টারে করে যাব আসল জায়গায়।' নোটবই থেকে সন্তর্পণে চিত্র-বিচিত্র পাতাটা ছিঁড়ে বাবা তা এগিয়ে দিল ছেলের দিকে, 'ম্যাপটা তোকে দিলাম, ভালো করে মনে রাখবি,' — এই বলে ফের ডুব দিল খবরের কাগজে।

পেতিয়া শান্ত হয়ে বসে ইঞ্জিনের গুঞ্জন শুনতে শুনতে বাপের কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে। ভাবতে লাগল জবলজবলে মজাদার ছবিটার দিকে চেয়ে। তার কল্পনায় সেটা জীবন্ত হয়ে উঠল। সবুজ হয়ে উঠল রূপকথার অদেখা বন, তরতরিয়ে বইল মাছে ভরা নদী, বৈকাল হ্রদে ছলকে উঠল সীলমাছ আর প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ে দুলতে লাগল নীল জাহাজটা।

তিন্দা শহরে বিমান ছেড়ে পেতিয়া আর বাবা উঠল হেলিকপ্টারে। একেবারেই সেটা বিমানের মতো নয়। জিনিসটা সবুজ রঙের, ছোট্ট, ডানা নেই। তবে পিঠের ওপর ছিল প্রপেলার।

হাতে স্যুটকেস নিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে যখন তারা ভেতরে ঢুকল, বাবা বললে: ‘এটা হল মাল বওয়ার হেলিকপ্টার। বৈ.আ.রে-তে হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। টিপ-আপ লরিগুলো তো ঝিল সাঁতরে পেরতে কি পাহাড়ে উঠতে শেখে নি এখনো। অথচ মাল দরকার প্রচুর।’

হেলিকপ্টারের ভেতর হরেক রকমের মাল সত্যিই অনেক। কোথায় যেন লোকে তার অপেক্ষায় আছে। নির্মাতাদের কাজকর্ম আর দিন কাটানোর জন্যে তার খুবই দরকার। ছিল সেখানে পেট্রল ভরা লোহার পিপে, লাল লাল টমাটো ভর্তি প্যাকিং বাক্স, জ্যামের বয়াম, বস্তা বস্তা আলু আর ক্রস-কান্ট্রি গাড়ি আর অন্যান্য যন্ত্রের স্পেয়ার পার্ট্স। অথচ যাত্রী বলতে পেতিয়া আর বাবা ছাড়া কেউ নেই।

বৈমানিকের নীল উর্দি আর টুপি পরা চালক শেষ পর্যন্ত বাবা আর পেতিয়ার সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে সিঁড়িটা তুলে নিল ভেতরে, কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আর সশব্দে প্রপেলার ঘুরিয়ে হেলিকপ্টার আকাশে উঠতে লাগল ঠিক ডাঁশ-মশার মতো। পেতিয়ার মনে হল হেলিকপ্টার চালক হওয়া কী চমৎকার। মাটি থেকে বিশেষ উঁচুতে উড়ছিল না হেলিকপ্টার। হয়ত পাখিরা
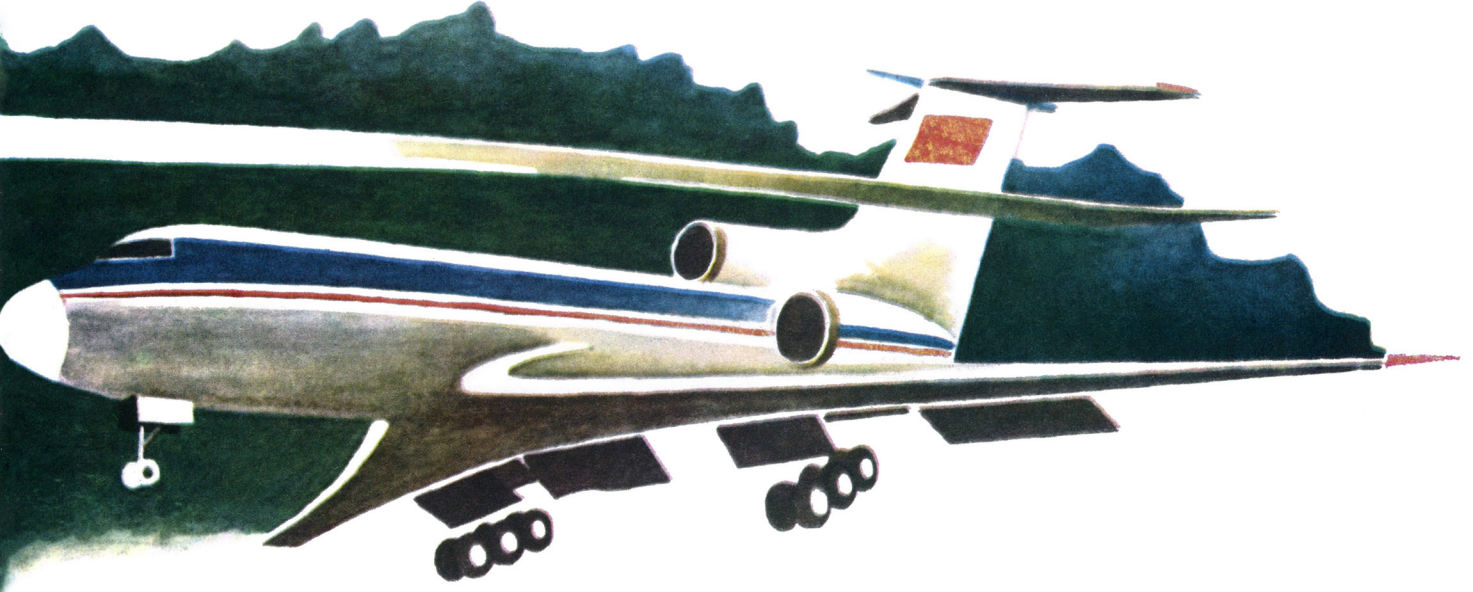
এই রকমই ওড়ে। এবার ওপর থেকে পেতিয়া যত্ন করে দেখতে লাগল তিন্দা শহর। বাবা বলেছে, বৈ.আ.রে-তে এই শহরটাই সবচেয়ে বড়ো। রাস্তায় রাস্তায় ছুটন্ত মোটর গাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। তবে পেতিয়ার মনে হল ওটা আদৌ শহর নয়, শহরের বাচ্চা। ওপর থেকে তাকে মনে হচ্ছিল ভারি ছোটো, একেবারে যেন খেলনা — কালো ফিতের মতো দেখতে আঁকাবাঁকা তিন্দা নদীর পাড়ে সবুজ ঢিপকপালে খাড়া পাহাড়গুলোর চাপে পড়া মুঠোখানেক ছোটো ছোটো বাড়ি।

'শহরটার বয়স তোর চেয়েও কম,' বললে বাবা, 'সবে তিন বছর হল একে শহর বলা হচ্ছে।'

'মাত্র তিন বছর? কী বাচ্চা!' হেসেই উঠল পেতিয়া।

তিন্দায় ইঁটের বাড়ি আঙুলে গোনা যায়। পেতিয়াও তাই করলে, পাঁচটা আঙুলেই কুলিয়ে গেল। তবে চারিদিকেই চলে গেছে নীল লাল সবুজ ওয়াগনের সারি। মনে হল রেলগাড়ির মতো করে তা জুড়ে দিলে যেদিকে খুশি গড়গড়িয়ে চলে যাবে। কিন্তু কোথাও যেতে পারছে না ওয়াগনগুলো, কেননা রেললাইন নেই।

গোল জানলা দিয়ে বাবাও নিচে তাকিয়ে বললে:

'এইসব ওয়াগনে লোক থাকে, শহর আর পথ বানাচ্ছে তারা। শীতকালে যখন ঠান্ডা পড়বে, সব ঢেকে যাবে বরফে, তার মধ্যেই বাড়ি বানানো হয়ে যাবে, সেগুলো গরম থাকবে, তাতে উঠে আসবে এরা।'

সগর্বে পেতিয়া চাইল বাবার দিকে। বাবা তো এখানে এই প্রথম আসছে না! কত কী জানে বাবা! কেমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দেয়।
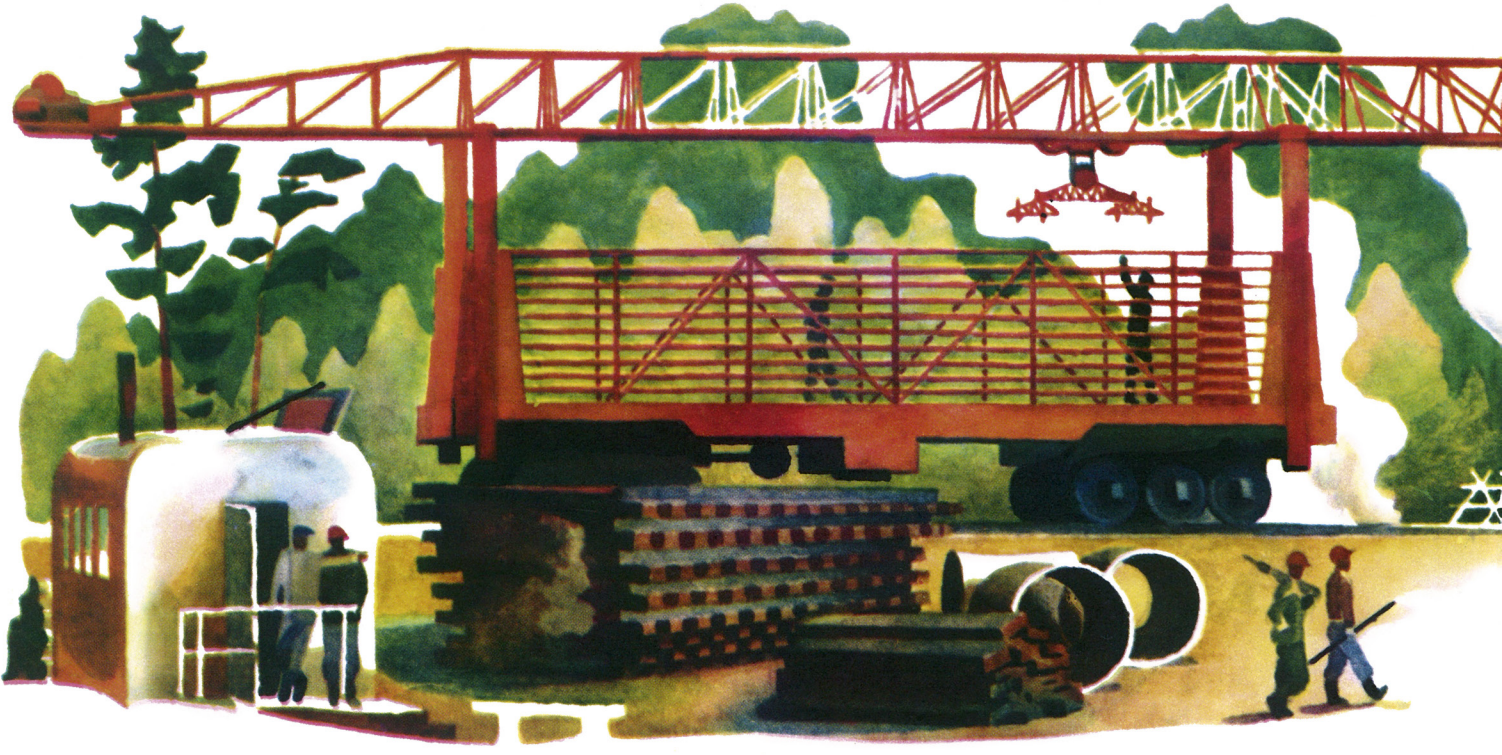
'আর এক্ষুনি,' জানলার দিকে না তাকিয়েই বাবা বললে, 'বৈ.আ.রে দেখতে পাবি। একেবারে সেই পথটা। এখানে বলে বড়ো বৈ.আ.রে। এই অংশটা এখানে বানানো হয়ে গেছে।'

শক্ত সীটের ওপর চটপট হাঁটু গেড়ে বসল পেতিয়া। ভালো করে দেখার জন্যে এই কান্ডটি সে প্রায়ই করে বাসে। আর সত্যিই দেখতে পেল।

নিচে, বাবার ছবিতে যা আঁকা আছে ঠিক তেমনি সবুজ গালিচায় ঢাকা পাহাড়ে টিপির মধ্যে দিয়ে নদীর মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে রেললাইনের ফিতে। শুধু লাইনটা লাল নয়, ছেয়ে রঙের। তবে নদীগুলো ম্যাপের মতো নীল নয়, লাল, এমনকি বাদামী। পেতিয়া ভাবলে, ম্যাপে তারা এঁকে যা দেখানো হয়েছে সেই গুপ্তধনগুলো আশেপাশেই কোথাও হবে। চোখ তুললে পেতিয়া, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না, কেননা সেসব ধন তো মাটির নিচে লুকানো। তবে যা দেখতে পেল তা অপরূপ, একেবারে অবাক করে দেয়। যতদূর চোখ যায় সবখানে সবুজ উর্দি পরা অসংখ্য সৈন্যের মতো মাথা তুলে আছে টিপি। দিগন্তে কুহেলীর মধ্যে খাঁজ কাটা নীল পাহাড়। তাদের ওপর জ্বলজ্বল করছে উঁচু নীল আকাশ। অবাক হয়ে পেতিয়া জিজ্ঞেস করলে:

'এইটেই সাইবেরিয়া?'

গর্বের সুরে বাবা বললে:

'হ্যাঁ রে খোকা, এই হল আমাদের সাইবেরিয়া।' তারপর খানিক থেমে পেতিয়াকে জিজ্ঞেস করলে: 'ঠান্ডা লাগছে না তোর?'

হেলিকপ্টারের পাতলা শার্সির ওপাশে প্রচন্ড শনশন করছিল উল্টো দিক থেকে আসা বাতাস। মাথা নাড়লে ছেলেটা কেননা সত্যিই ঠান্ডা লাগছিল।

স্যুটকেস খুলে উলের লাল সোয়েটারটা বার করে পেতিয়াকে পরাল বাবা। এটি খুব মানায় ওকে। তারপর বার করলে একেবারে নতুন, কানাওয়ালা নীল টুপিটা। 'ভাগ্যিস মা ভেবেছিল আমাদের জন্যে।'

পেতিয়া নিজেই টুপিটা পরলে। এখন তাকে দেখাচ্ছে সম্ভবত পাইলট, না, হেলিকপ্টার-চালক, নাকি জাহাজীর মতো?

হেলিকপ্টার ওদিকে নামতে শুরু করেছে। তক্ষুনি সেটা টের পেল পেতিয়া, কেননা পায়ের নিচের মেঝেটা যেন খসে পড়ছিল। খুশিতে আর ভয়ে ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল: 'সেকী, আমরা এসে গেলাম?'

এখনো ঠিক নয়। এখানে রেললাইন আপাতত শেষ হচ্ছে। এখানে কিছু কিছু মাল নামিয়ে আমরা চলে যাব আগে। নদীর ওপর সেতু বাঁধতে।'

পেতিয়া শার্সিতে মুখ রেখে যা দেখল সেটা অভূতপূর্ব। হেলিকপ্টার নামল ধূসর পাথুরে একটা চত্বরে। আর তার কিছু দূরে রেললাইন সত্যিই শেষ হয়ে গেছে, সর্বত্র ছোটাছুটি করছে লোকে, কাজ করছে এক্সক্যাভেটর, বুলডোজার, ছুটছে ট্রাক আর লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কী এক আশ্চর্য যন্ত্র। কিন্তু উচিত মতো সেটা দেখে ওঠার সুযোগ হল না, কেননা ঝাঁকুনি দিয়ে হেলিকপ্টার ততক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। ইঞ্জিন চুপ করে গেল, ড্রাইভার উঠে এসে গোল দুয়োরটা খুলল, পেতিয়া আর বাবা লাফ দিয়ে নামল শক্ত জমিতে।

বাবা বললে: 'আমরা যতক্ষণ মাল খালাস করছি ততক্ষণ একটু ঘুরে আয় গে। তবে বেশি দূর যাস না।'

যেসব লোক এসেছিল তারা আর বাবা কথাবার্তা বলছিল, কাজ করছিল, সেই ফাঁকে পেতিয়া তাকিয়ে দেখল চারিদিকটা।

হাওয়াই ডিঙ্গির প্রচণ্ড আওয়াজের পর প্রথমটা পেতিয়ার মনে হয়েছিল চারিপাশটা ভারি চুপচাপ। কিন্তু শিগগিরই টের পেল ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। দেখা গেল আওয়াজ প্রচুর আর হরেক রকমের। গোঁ-গোঁ করছে ইঞ্জিন, কাজের হুকুম দেওয়া হচ্ছে চিৎকার করে। সামনেই তার ধূসর খোয়া পাথরের লম্বা সমতল বাঁধ-পথ। কিছু দূরেই তা শেষ হয়ে গেছে আর রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, গর্জন করে সেদিকে পেতিয়ার কাছ দিয়ে যাচ্ছে খোয়া ভর্তি একের পর এক নীল আর কমলা রঙের টিপ-আপ লরি। পাঁজরায় বাঁধানো বডি ওপরে তুলে তারা পাথর ফেলছে মাটিতে, ঘাস আর ঘাসের চাঙড়ে। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠছে, এগিয়ে যাচ্ছে বাঁধ-পথ। অন্যদিকে বুলডোজারের মতো অন্যান্য যন্ত্র, তাও এখানে কম নেই, ইস্ত্রির মতো বাঁধের ওপরটা আর দু'পাশ পরিপাটী করে সমান করে দিচ্ছে, ফলে ইস্পাতের রেল বসানো যাবে তার ওপর। পেতিয়া বুঝল, বাঁধ খুবই দরকারী কেননা রেলগাড়ি তো ভারী, রেললাইনের তলে একটা মজবুত বনিয়াদ না থাকলে তা গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। কিন্তু পেতিয়া যা দেখল তার কাছে এসব কিছুই অবাক করার

মতো নয়। সবচেয়ে অবাক কান্ড, অসাধারণ একটা যন্ত্র, পেতিয়া তা জীবনে দেখে নি। এমনকি ওই ধরনের কোনো খেলনাও তার ছিল না। রেললাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সেটা, দেখতে হাঁটু গেড়ে বসা, বাঁধের ওপর ঘাড় নোয়ানো জিরাফের মতো। আর সেই রকম লম্বা গলায় ধরে আছে রেল আর স্লিপার দিয়ে বানানো গরাদে, যেন লোহার সিঁড়ি। রেলের লাইন এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে খুব ধীরে ধীরে তা নামানো হচ্ছিল। পেতিয়া টের পেল, এই লৌহ জিরাফ অতি বাধ্য। হাই-বুট আর দস্তানা পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার নাকের ডগায়। গরাদে কীভাবে নামাতে হবে, থেকে থেকে তার নির্দেশ দিচ্ছিল সে, ঠিক অর্কেস্ট্রা পরিচালকের মতো হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করছিল: 'নামিয়ে! আরেকটু নামিয়ে!..'

ওর কাছ দিয়ে রাস্তা বানিয়েদের একজন যাচ্ছিল, পেতিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলে: 'আচ্ছা বলুন-না, এ যন্ত্রের নাম কী?'

যেতে যেতেই লোকটা জানাল: 'লাইন-পাতা যন্ত্র। শতেক লোকের কাজ করে দেয়।'

পেতিয়া ভাবল: 'লাইন-পাতা যন্ত্র বোধহয় বৈ.আ.রে-র সবচেয়ে প্রধান যন্ত্র। কী কায়দা করে নিখুঁতভাবে লাইন পাতছে লোহার জিরাফ, লোকের কী বাধ্য। চোখ বড়ো বড়ো করে সে দেখছিল, সম্ভবত দেখতে পারত অনেক, অনেকক্ষণ ধরে, কেননা সামনে তার বানানো হচ্ছে সত্যিকারের বড়ো বৈ.আ.রে। 'ইস, কোথায় সে আছে, কী দেখছে, তা যদি জানত তার পাড়ার ছেলেপুলেরা!'

কিন্তু এই সময় ডাক দিল বাবা:

'যাবার সময় হয়েছে খোকা!'

অনিচ্ছাতেই পেতিয়া গেল হেলিকপ্টারের কাছে। 'কেন যে আবার কোথাও যাওয়া। এ জায়গাটা তো ভারি চমৎকার!'
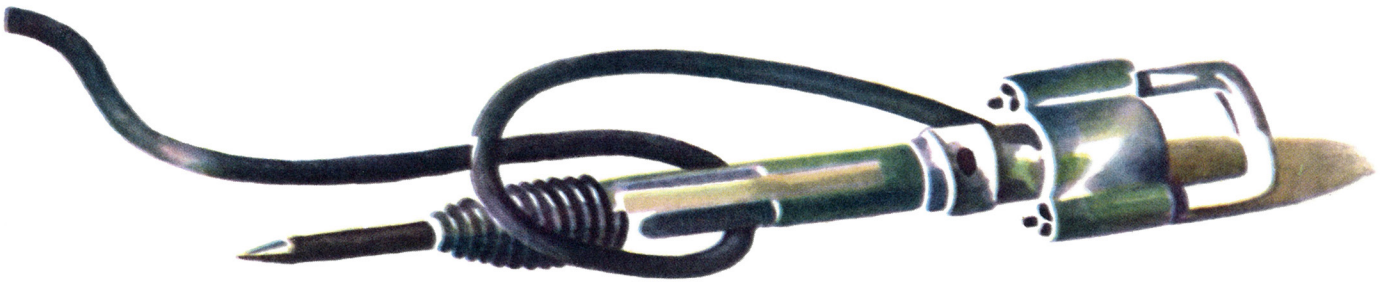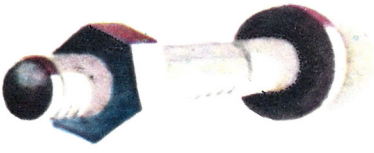
কিন্তু পরে যা, তা আরো দেখবার মতো। সমান তালে গুঞ্জন করে হেলিকপ্টার খাড়া উঠে গেল ওপরে, ফের উড়তে লাগল পূবের দিকে। এবার নিচে রেলপথের চিহ্ন নেই। এখনো রাস্তাঘাট হয় নি এদিকে। চারদিকে বহু বহু কিলোমিটার ধরে না দেখা যায় ধোঁয়া, না ঘরবাড়ি, কেবল বন, উপত্যকা, পাহাড় আর জন্তু-জানোয়ারের চরে বেড়াবার পথ। 'হ্যাঁ,' ভাবলে পেতিয়া, 'এ একটা দেখবার মতো জিনিস বটে। এখনো এখানে মানুষের পা পড়ে নি।'

পাহাড়গুলো হয়ে উঠতে লাগল ক্রমেই উঁচু উঁচু, কোথাও কোথাও চুড়োয় আর বন নেই, উপত্যকাগুলো দেখা দিল ক্রমেই এলাহি চেহারায়। এখন তা আর সবুজ নয়, লালচে।

বাবা বললে: 'ঐ দ্যাখ, এখানে সবই জলা। জলাগুলো ঢিবিতে ঢাকা আর ঢিবির ওপর গজায় লাল শ্যাওলা আর লাল বৈঁচি। নীল বৈঁচিও আছে, তাকে বলে নীলু।'

'নীলু খাওয়া যায়?'

'খাওয়া যায় বৈকি। ভালুকরা তা খুব ভালোবাসে। এল্‌ক আর হরিণেরাও তা খায়। এই তো, গিয়ে তুই নিজেই চেখে দেখবি। নীলু দিয়ে পিঠে হয় খাশা।'

'ইস, তাড়াতাড়ি পোঁছতে পারলে হয়!' নিচে তাকাল পেতিয়া, আরো কিছু দেখবার মতো নেই কি সেখানে? চোখে পড়ল তাদের হেলিকপ্টারের কালো ছায়া। সে ছায়া কখনো পিছলে যাচ্ছে

লাল জলার ওপর দিয়ে, কখনো আবার আলগোছে উঠে আসছে টিলা-পাহাড়ে, নেমে আসছে উপত্যকায়, পেরিয়ে যাচ্ছে নদী। যেন ভবিষ্যৎ সড়কের পথ এ'কে চলেছে তা, আর সে সড়ক দিয়ে যাবে ট্রেন, ফোঁস ফোঁস করবে ইঞ্জিন, রেলের ওপর ঝকঝক শব্দ তুলবে ওয়াগন। 'হয়ত মা-বাবার সঙ্গে আমি সেই ওয়াগনে চেপেই যাব।'

'কিন্তু এটা কী ?!' হঠাৎ চিৎকার করে পেতিয়া আঙুল দেখাল নিচে।

নিচে সে দেখতে পেয়েছিল একটা নদী, অন্য সমস্ত নদীর মতোই দেখতে, কিন্তু তার ওপরে শাদা ধোঁয়ার মিহি কুণ্ডলী আর তীরে পাইন গাছগুলোর কালচে চুড়োর ভেতর দিয়ে ঠাহর করা যায় ছাউনির চালা, গোটা একটা ছাউনি নগর।

'এটা কী বাবা ?!'

বাবা বললে: 'এই তো এসে গেলাম! এটাই আমাদের প্লট, দিয়োস নদীর ওপর সেতু হবে এইখানে।'

'কিন্তু আমরা থাকব কোথায়?' অস্থির হয়ে উঠল পেতিয়া, 'স্রেফ বনের মধ্যে?' বনে কখনো সে থাকে নি।

বাবা হাসল, 'অত তাড়াহুড়ো করিস না। নিজেই দেখতে পাবি।'

একটুখানি বাতাসে স্থির হয়ে রইল হেলিকপ্টার, তারপর খাড়াইভাবে নামতে লাগল নিচে, ফের পেতিয়ার পায়ের নিচেকার মেঝে যেন খসে যেতে লাগল। কিন্তু সেদিকে পেতিয়ার মন ছিল না, সাগ্রহে সে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে। এগিয়ে আসতে লাগল টিলার পাথুরে চুড়ো, পাইনের সবুজ ডগা। লোকজনও দেখা গেল, ছাউনি থেকে বেরিয়ে তারা ছুটে আসছিল তীরের দিকে হেলিকপ্টারের উদ্দেশে। হালকা রঙের একটা কুকুরও চোখে পড়ল পেতিয়ার, বালু ভরা ঢালুতে ফুর্তি করে লাফাচ্ছিল সেটা। নদীর কালচে জলও এগিয়ে আসছিল, আর একটু ভয়ই হল পেতিয়ার, হেলিকপ্টার যদি ভুল করে জলে নামে? কিন্তু হেলিকপ্টারের ছায়াটা লাফিয়ে গেল পাথর ভরা তীরে, নামল তা নিজেরই ছায়ার ওপর। দরজা খোলার পর ওরা যখন লাফিয়ে নামল মাটিতে, তখন খানিকটা জড়োসড়ো লাগল পেতিয়ার, কেননা তাদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছিল হৈচৈ করে। দেখা গেল বাবার সঙ্গে এখানকার লোকদের খুবই জানাশোনা, সবাই তার পথ চেয়ে ছিল, তাছাড়া তার আরো একটা কারণ ছিল, কেননা তারা আসছে, এখানকার লোকে যা বলে, 'বড়ো ভুঁই' অর্থাৎ খাস রাশিয়া থেকে। সবাই কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করছে, বাবার জিজ্ঞাসারও উত্তর দিচ্ছে। কথাবার্তার মধ্যে পেতিয়ার কথা যেন ভুলেই গেছে তারা। তার ওপর আবার চিঠিপত্রের থলি, খাবার-দাবার, পিপে-টিপে নামাতে লেগে গেল সবাই। প্রথম তার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এল বেড়ির মতো গুটানো লোমশ লেজওয়ালা হলদে রঙের কুকুরটা। পেতিয়ার পা, হাত, লাল সোয়েটারটা শুঁকে দেখার পরই কেবল সে বন্ধুর মতো তার বেড়ি-লেজটা নাড়তে লাগল।

পেতিয়া বললে: 'আয় বন্ধুত্ব পাতাই। কী নাম তোর?'

'ওর নাম র‍্যাম,' পেতিয়ার মাথার ওপর শোনা গেল একটা ভরাট গলা, 'এটা লাইকা জাতের কুকুর। শিকারে র‍্যাম ভারি দড়।'

পেতিয়া দেখল বেরে টুপি মাথায়, অয়েলক্লথের কোর্তা আর হাই-বুট পরা একজন লোক। পেতিয়ার সামনে আধ-বসা হয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিলে:

'আমি জানি তোর নাম পেতিয়া। আর আমার নাম পিওত্র্ ইভানোভিচ,' — পেতিয়ার বাপের দিকে ধূর্ত চোখে চাইল সে, 'মোটের ওপর আমাদের প্লটে এখন দুজন পেতিয়া — বড়ো পেতিয়া আর ছোটো পেতিয়া।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তা আপাতত সবাই যে যার কাজ করে যাক, চল আমরা ক্যাণ্টিনে যাই খেতে। মাশা মাসি তোর জন্যে খাশা কী একটা রেঁধেছে।' পেতিয়ার সে হাত ধরল, তারপর নদী থেকে পাথর-নুড়ি ভরা তীর ধরে তারপর বালু ভরা ঢালু বেয়ে ওরা চারজন, পিওত্র্ ইভানোভিচ, বাবা, পেতিয়া আর র‍্যাম উঠল ওপরে পাইন গাছগুলোর কাছে। সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছিল, গন্ধ আসছিল খাবারের।

কিন্তু সেখানে কোনো ক্যাণ্টিনই পেতিয়ার নজরে পড়ল না। পাইন গাছগুলোর মধ্যে গত বছরের ঝরে পড়া বাদামী পাইন কাঁটা বিছানো জায়গাটায় ছাউনির সারি, গ্রীষ্মের রোদে রঙ তাদের জ্বলে গিয়ে প্রায় শাদা হয়ে এসেছে। একটু পাশে রোলার দেওয়া সমান জমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্যাটারপিলার ক্রস-কান্ট্রি গাড়ি, দেখতে ট্যাঙ্কের মতো, শুধু কামানের নল নেই। আরো ছিল দুটো ট্র্যাক্টর, আর কী একটা যন্ত্র যার নাম পেতিয়া জানে না। একটু দূরে কাঠের গুঁড়ির ছোটো একটা বাড়ি, তাতে চিমনি আছে কিন্তু জানলা নেই। কোনো ক্যাণ্টিন চোখে পড়ল না পেতিয়ার। তাহলেও ওই বাড়িটাকেই দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে:

'এইটেই ক্যাণ্টিন?'

কিন্তু পিওত্র্ ইভানোভিচ হেসে উঠল:

'না রে খোকা। ওটা স্নানের ঘর। খাঁটি রুশী গোসলখানা। কাজের পর আমরা ওখানে গা ধুই। তুইও ধুবি। আর ক্যাণ্টিন হচ্ছে ওইটে,' বলে হাত দিয়ে দেখাল।

তাহলেও কোনো ক্যাণ্টিন দেখতে পেল না পেতিয়া, দেখল শুধু চারটে খুঁটির ওপর তক্তার একটা চালা, তার নিচে তক্তার একটা লম্বা টেবিল আর তক্তার বেঞ্চি। এইখানেই ওই চালার নিচে ধোঁয়াচ্ছে লোহার চুল্লি, ফটফট শব্দ করে পুড়ছে কাঠ, ডেকচিগুলোয় কী যেন টগবগ করছে আর মিঠে গন্ধ ছাড়ছে পাইনের রজন। স্বাদু কী একটা সুঘ্রাণও পাওয়া গেল। চুল্লির কাছে দাঁড়িয়ে আছে শাদা বাবুর্চি টুপি আর অ্যাপ্রন পরা বর্ষীয়সী একজন মেয়ে। 'নিশ্চয় মাশা মাসি,' — ভাবল পেতিয়া।

মেয়েটি সোহাগ করে বললে:

'তাহলে এসে গেলে,' টেবিলে ডিশ আর মগ রাখতে লাগল সে, 'তাড়াতাড়ি খেতে বসো। এতটা পথ, হয়রান হয়ে গেছ, খিদেয় মরছ? আমি তোমাদের খাওয়াব পেট ভরে।'

সবাই বসলে সে ডিশে ডিশে ঢালল ব্যাঙের ছাতার স্নুপ।

'ওহ্, আমাদের এখানে এখন ব্যাঙের ছাতা কত! তুলে আর শেষ হয় না। প্রায় প্রতিটি গাছের নিচেই ব্যাঙের ছাতা। এবার তা তুলতে আমার আরো একজন সহকারী জুটল,' বলে হাসল পেতিয়ার উদ্দেশে। তারপর ছাউনিগুলোর দিকে ফিরে চিৎকার করে ডাকল: 'ইতিল! এই ইতিল! লুকিয়ে থাকবি না বলছি। বরং খেতে আয় এখানে। আলাপও করে নিবি।' আরো একটা ডিশে স্নুপ ঢালল সে। কিন্তু ছাউনি থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। বাবা আর পিওত্র্ ইভানোভিচ খেতে খেতে কাজের কথা বলাবলি করতে লাগল — সেতুর কথা, দিয়োস — এমন একটা অদ্ভুত নামের নদীটার ওপর যা বানানো হবে, বোরিং মেসিনের কথা যা ঠিকঠাক করবে বাবা, পাইলের কথা হিমে জমা মাটিতে যা বসানো হবে। 'হিমে জমা মাটি এখানে কোথায়?' ভাবলে পেতিয়া, 'চারদিকেই তো বেশ গাছপালা আর গরম,' — জিজ্ঞেস করার ফুরসুত হল না, কেননা চোখে পড়ল, একটা ছাউনির পর্দা সরিয়ে দেখা দিল ফারের কোর্তা আর হাই-বুট পরা একটি ছেলে। র‍্যাম তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগল তার পায়ের কাছে।

'আয় ইতিল, তাড়াতাড়ি খেতে আয়,' ডাকল মাশা মাসি, 'নইলে সব জুড়িয়ে যাবে।'

ইতিল এগিয়ে এল, মৃদুস্বরে নমস্কার জানাল, বোঝা গেল নতুন লোক দেখে সঙ্কোচ হচ্ছে। বসল পেতিয়ার উল্টো দিকে আর থেকে থেকেই তার কালো সরু চোখ দিয়ে কৌতূহলে দেখতে লাগল পেতিয়াকে। সম্ভবত ছেলেটা পেতিয়ারই সমবয়সী।

কিন্তু এমন ছেলে পেতিয়া আগে কখনো দেখে নি। ময়লাটে রঙ, গালের হাড় উ'চু, কড়া কালো চুল নেমে এসেছে প্রায় ভুরু পর্যন্ত। ডিশ সামনে নিয়ে এইভাবেই বসে রইল দুটি ছেলে, দুই সমবয়সী, একজনের চুলের রঙ পাতলা, অন্যজনের কালো।

'ইতিল প্রায়ই আসে আমাদের এখানে,' বললে পিওত্র্ ইভানোভিচ, 'থাকে ও পাশেই এভেংক-দের ডেরায়। হরিণে করে ও বাপের সঙ্গে মাংস নিয়ে আসে আমাদের জন্যে।'

'হরিণে করে?' তাজ্জব বনে গেল পেতিয়া, ইতিলের দিকে সে তাকাল সোল্লাসে, 'কোথায় হরিণ?'

'ওই টিলার নিচে,' কোন একদিকের উদ্দেশে মাথা হেলাল ইতিল।

'দেখাবি?' চোখ জবলজবল করে উঠল পেতিয়ার।

'দেখাব,' মাথা নাড়ল ছেলেটা।

তক্ষুনি লাফিয়ে উঠতে চাইছিল পেতিয়া কিন্তু মাশা মাসি কড়া গলায় বললে:

'তার ঢের সময় আছে। সূর্য পাটে বসবে না শিগগির। আগে আমার নীলু বৈ'চি ফলের পিঠে খেয়ে নাও।' প্লেটে করে লালচে পিঠে এনে দিল সে।

সত্যি, আজকের দিনটা পেতিয়ার কাছে অসাধারণ। একদিনের মধ্যে কত অভিনব ব্যাপার! তার একটা অবশ্যই নীলু ফলের সুগন্ধি পিঠে। মুখে দিতে না দিতেই গলে যায়।

'এবার যাও,' খাওয়া শেষ হতে অনুমতি দিলে পেতিয়ার বাবা, 'তোমরা তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার দ্যাখো, আমরা দেখব নিজেদের কাজ।'

'শুধু বেশি দূরে যেও না,' সাবধান করে দিলে মাশা মাসি, 'সন্ধ্যা নাগাদ পেতিয়াকে নিয়ে আসিস তার ছাউনিতে, বুঝেছিস ইতিল? আর এই নে, একটা করে পিঠে।'

প্রথমে তারা ছুটল ছাউনি শহর দিয়ে। ইতিল আগে আগে, তার পরে পেতিয়া, তাদের পেছনে ফুর্তি করে লাফাচ্ছিল হলদে কুকুর র‍্যাম। একটা ছাউনিতে দেখা গেল অদ্ভুত এক নোটিশ: 'বারোমেসে হিম নষ্ট করা নিষেধ'। ব্যাপারটা কী জিজ্ঞেস করার ফুরসুত ছিল না। ছোট্ট একটা রাস্তা জোড়া ছাউনি শহর ফুরিয়ে গেল শিগগিরই, আর রাস্তাটা পৌঁছল বনে। তারপরে কেবলি পাইন গাছের গোলাপী গুঁড়ি, রোদে ঝলমলে, কেবলি পাতার মর্মর। হঠাৎ থেমে গেল পেতিয়া। এমন বনে সে কখনো আসে নি। একটু ভয় ভয় করল।

ফিরে তাকাল ইতিল, 'কী রে তুই! চল-না, এই তো কাছেই!' র‍্যাম এগিয়ে গিয়েছিল আগেই। পেতিয়ার দিকে চেয়ে সে যেন আস্ফালন করে ডাক ছাড়ল। পেতিয়াও এগিয়ে গেল।

শুধু বনে তারা আর ছুটছিল না, যাচ্ছিল ধীরেসুস্থে, কেননা প্রতি পদেই দেখবার মতো ছিল কিছু না কিছু। মাশা মাসি যা বলেছিল, প্রত্যেকটি গাছের নিচেই কোনো না কোনো ব্যাঙের ছাতা। পায়ের নিচে পাইন কাঁটার হালকা গদি, চারিদিকে ছড়ানো পাইন গাছের সুন্দর সুন্দর মোচা, কোনোটা আস্তো, কোনোটা ফাঁপা।

'কাঠবেড়ালি খেয়েছে বুঝি?'

'না, মেঠো ইঁদুর,' বলে ইতিল ডাকল কুকুরকে, 'র‍্যাম, খোঁজ, খুঁজে বার কর।'

র‍্যাম ছুটে গেল পাইন গাছগুলোর দিকে। একটার কাছে থেমে মাথা উঁচু করে ডাকতে লাগল। এত জোরে যে গম-গম করে উঠল সারা বন। একেই বলে লাইকা কুকুর।

'ঐ দ্যাখ, দ্যাখ, দেখতে পাচ্ছিস?' চেঁচিয়ে উঠল ইতিল।

তখন পেতিয়ার চোখে পড়ল লালচে গুঁড়ির ওপর সাদাটে ছোপ। ছোপটা কেন জানি ওপর থেকে নিচে নেমে এসে থেমে গেল।

'হাঁদারাম!' হেসে উঠল ইতিল।

'এ যে কাঠবেঁড়ালি!' চেঁচিয়ে উঠল পেতিয়া।

'আরে, নজর করে দ্যাখ!'

সত্যিই কাঠবেড়ালির মতো ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লেজ জন্তুটার, কালো কালো পুঁতির মতো চোখ, চটপটে থাবা। তবে রঙটা হলদেটে, পিঠের ওপর তিনটে জ্বলজ্বলে বাদামী ডোরা।

'মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে মেঠো ইঁদুর, লজেন্স, বিস্কুট,' বললে ইতিল, 'প্রায়ই সেঁধোয় ছাউনিতে। ভাবনা নেই, আরো অনেক দেখা হবে।'

আরো এগিয়ে গেল তারা।

'আচ্ছা, ওর পিঠে ডোরা কেন?'

'ডোরা? ওটা ভালুকের থাবার দাগ,' নিতান্ত সহজে বললে ইতিল।

'তার মানে?' থেমে গেল পেতিয়া।

'ভালুক একবার মেঠো ইঁদুরকে ডেকেছিল দৌড়ের খেলায়। বললে, যে জিতবে সে অন্যকে খাবে। এ খেলায় নামার কোনো ইচ্ছে ছিল না মেঠো ইঁদুরের, কিন্তু আপত্তি করবে কী করে? তাইগায় ভালুকই যে পশুরাজ। শুরু হল খেলা। ভালুক ছুটল প্রথমে। মেঠো ইঁদুর গাছপালার মধ্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। ভালুক তাকে আর ধরতে পারে না। একেবারে জেরবার হয়ে গেল। তখন শয়তানি করলে। বললে, আমি একটু জিরিয়ে নিই, পরে খেলব। শুল সে বনের ফাঁকায়। মেঠো ইঁদুর বসল তার পাশেই, সামনের দু'পা দিয়ে মুখ ঘষতে লাগল। আড়চোখে ব্যাপারটা দেখে ভালুক সঙ্গে সঙ্গেই খাবলে ধরল তাকে।'

মেঠো ইঁদুরের জন্যে ভারি কষ্ট হল পেতিয়ার।

ইতিল বললে: 'তাহলেও ফসকে পালাল মেঠো ইঁদুর। শুধু ভালুকের থাবার এই দাগগুলো রয়ে গেছে পিঠে।'

'আচ্ছা, ভালুক আছে এখানে?' শঙ্কিত প্রশ্ন করল পেতিয়া।

'কত চাই! তবে লোকেদের কোনো অনিষ্ট করে না। শুধু মাঝে মাঝে আসে।'

বন ওদিকে পাতলা হয়ে এল, ছেলেরা পৌঁছল কিনারায়। পায়ের নিচে চপচপ করছে চাঙড়, নরম লাল শেওলায় ঢাকা, বেরিয়ে আছে নীল, লাল বৈঁচির শাখা। সবটাই শেওলা আর বৈঁচিতে ঢাকা, খাও-না যত খুশি। তার ওপর কিছু দূরে চরে বেড়াচ্ছে দুটি চমৎকার হরিণ, অল্প লোমে ভরা পল্লবিত শিঙ। এই সৌন্দর্য দেখে পেতিয়া থেমে গেল।

'এগুলো তোর?'

'আমার,' মাথা নাড়ল ইতিল।

'বটে!'

'খুব পোষা। ভারি বাধ্য,' বললে ইতিল।

'কিন্তু বারোমেসে হিম এখানে কোথায়?'

'এই তো,' ঢালাও হাত নেড়ে জানাল ছেলেটা, 'এতো সবখানেই। আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার ওপরেই। শুধু ওপরে জলা, আমরা বলি মার। তাকিয়ে কী দেখছিস? কিছুই দেখবি না, ও যে শেওলার তলে।' ইতিল শেওলার ওপর লাফাল খানিকটা। 'মিটার খানেক নিচে শক্ত হিমে জমা মাটি, এমনকি বরফ। শীতকালের মতো।'

'কিন্তু হিম বাঁচিয়ে রাখা যাবে কেমন করে?' ছাউনির নোটিশটার কথা মনে পড়ায় জিজ্ঞেস করলে পেতিয়া।

'রোদ্দুরে গরম হতে না দিলেই হল। হিমের গায়ে যেন রোদ না লাগে। দেখছিস এইসব শেওলা আর চাঙড়? শত শত, হয়ত হাজার হাজার বছর ধরে তা হিমে জমা মাটি ঢেকে রেখেছে, ওপরকার এই স্তরটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তা ভাঙা চলবে না।' চারিদিকে তাকিয়ে দেখে হাত দোলাল ইতিল, 'দেখছিস, ক্রস-কান্ট্রি গাড়ির দাগ কত। গাড়িগুলো এখানে একই পথ ধরে যাতায়াত করে না, তাতে শেওলা নষ্ট হয় না ক্যাটারপিলারে। এবার বুঝলি?'

'বুঝেছি,' মাথা নাড়ল পেতিয়া, তাকিয়ে দেখল হরিণের দিকে, খুবই কাছে এসে পড়েছিল তারা। জিজ্ঞেস করলে:

'আচ্ছা, চড়া যায় ওতে?'

ইতিল বললে: 'নিশ্চয়. চল যাই।'

সত্যি, পেতিয়ার জীবনে এটা একটা অসাধারণ দিন।

সন্ধে পর্যন্ত ইতিলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করল সে। লাগাম আর

খরখরে ডালপালার মতো শিঙ ধরে হরিণ চেপে বেড়াল তারা। ঝোপঝাড়ের ভেতরে দেখল চটপটে একটা মেরু-নকুল। তার ঝকঝকে বাদামী লোম জ্বলজ্বল করছিল রোদ্দুরে। আর মার-এর মধ্যে র‍্যাম তার ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পাইয়ে দিল একটা মুটকো রসোমাখাকে — পেতিয়া সঙ্গে সঙ্গেই

তার নাম দিল 'রসোমাখা পিসি'। চাঙড় থেকে চাঙড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গড়াতে গড়াতে তা পালিয়ে গেল দূরে, দেখে হাসিই পায়।

ওরা যখন নদীর পাথুরে তীরে কনকনে ঠান্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে জল ছিটাচ্ছে তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। নদীর অন্য পারে উঁচু একটা টিলার পেছনে হঠাৎ শোনা গেল প্রচন্ড একটা গর্জন। এত প্রচন্ড যে দুই হাতে কান ঢেকে বসেই পড়ল পেতিয়া। আওয়াজটা যেন অগ্নিগিরির উদ্গীরণ বা বোমা ফাটার মতো। কিন্তু কেন জানি ভয় পেল না ইতিল। পেতিয়াকে দেখে পাশে

দাঁড়িয়ে হিহি করে হাসতে লাগল সে। র‍্যামও ভয় পেল না; ফুর্তিতে লেজ নাড়তে নাড়তে সে চুকচুক করে জল খেতে লাগল তীরের কাছে।

'তুই কী রে! ভয়ের কিছু নেই!' শেষ পর্যন্ত বললে ইতিল, 'ওখানে আমাদের লোকেরা দিয়োস নদীতে পৌঁছে সেতুর পথ কাটার জন্যে পাহাড় ফাটাচ্ছে।'

'আচ্ছা, সেতুটা হবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পেতিয়া।

'চল তোকে দেখাই,' ঝিরঝিরে স্রোতকে পেছনে ফেলে ওরা ছুটল তীর ধরে, নদীর বাঁকটা পর্যন্ত। থামল সেইখানে।

'এই দ্যাখ, এইখানে সেতু হবে।'

কেবিন সমেত দুটো কমলা রঙের গাড়ি দেখতে পেল পেতিয়া, অনেকটা এক্সক্যাভেটরের মতো, কিন্তু অদ্ভুত ধরনের গরাদে দেওয়া গলা তুলে আছে আকাশে। আরো দেখল তীরে উঁচিয়ে আছে ছাই রঙের কংক্রিটের সব থাম, সমান সারিতে তা নেমে গেছে সোজা জলের মধ্যে।

কমলা রঙের যন্ত্রগুলো দেখিয়ে ইতিল বললে: এগুলো বোরিং যন্ত্র। জমে যাওয়া শক্ত মাটিতে তা ঝটপট গভীর ফুটো করে দেয়, সে ফুটোয় তখন এইসব থাম বসানো হয়। একে বলে পাইল।'

'কিন্তু সেতুটা হবে কোথায়?' তখনো বুঝতে পারছিল না পেতিয়া।

'এইসব থাম যখন গোটা নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছবে তখন তার ওপর বসানো হবে সেতুর মাচা, তার ওপর পাতা হবে লাইন, তখন সেতু দিয়ে যাবে রেলগাড়ি। বুঝলি?'

এবার সবই বুঝল পেতিয়া। সম্ভ্রমের সঙ্গেই সে তাকাল বোরিং যন্ত্রের দিকে, তাদের কাছে শ্রমিকদের মধ্যে চোখে পড়ল বাবার পরিচিত মূর্তিটা, শ্রমিকদের কী যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে।

পেতিয়া বললে: 'চল যাই ওখানে।'

ইতিল বললে: 'না, কাজের সময় ওখানে যাওয়া ছেলেপিলেদের মানা। কাল সকাল সকাল এখানে এসে সব দেখব। এখন বেলা থাকতে থাকতে চল বনে যাই, মাশা মাসির জন্যে ব্যাঙের ছাতা তুলি।'

'কিন্তু আমাদের যে ঝুড়ি নেই।'

'ধুৎ!' কথাটা উড়িয়ে দিল ইতিল, 'আমি তোকে কাঠিতে করে ব্যাঙের ছাতা তোলা শিখিয়ে দেব।'

'কাঠিতে করে?' তাজ্জব বনে গেল পেতিয়া।

বনে গিয়ে ডাল ভেঙে তার পাতা সাফ করে সেই চিকন কাঠিতে ব্যাঙের ছাতা গেঁথে গেঁথে রাখতে লাগল, যেন পুঁতির মালা। শিগগিরই কয়েকটা করে কাঠি ভরে উঠল ব্যাঙের ছাতায়।

লাল সূর্য পাটে বসার পর কালো আকাশে জ্বলজ্বলে তারা ফুটতেই এত ঠান্ডা লাগল পেতিয়ার যে কাঁপুনি ধরল তার। দূরে ছাউনিগুলোর কাছে দিব্যি ধুনি জ্বলছে। ছাউনি শহরের কাছে আসতে বিদায় নিল ইতিল:

'শুভ রাত্রি। কাল আবার দেখা হবে পেতিয়া।'

এই সময় বাবা এসে পেতিয়াকে নিয়ে গেল একটা বড়োসড়ো চালায়। ভেতরে লোহার চুল্লি জ্বলছে, কাঠ পুড়ছে ফটফট শব্দে। বেশ গরম, নিবিড়।

'এবার এইটে হবে আমাদের বাড়ি। পোশাক ছেড়ে এই থলেটায় ঢোক।'

ভারি অবাক লেগেছিল পেতিয়ার। তাহলেও পোশাক ছেড়ে বাঙ্কে ফারের থলের মধ্যে ঢুকল। ফারের থলিতে জীবনে কখনো ঘুমায় নি সে, এমন তা নরম আর গরম।

নিজেও ঘুমাবার তোড়জোড় করতে বাবা জিজ্ঞেস করলে: 'তা বৈ.আ.রে-র প্রথম দিনটা কেমন লাগল তোর?'

কিন্তু নিজের সমস্ত উল্লাস বোঝাবার মতো ভাষা জুটল না পেতিয়ার। শুধু নিঃশ্বাস ফেলল সে:

'ভারি ভালো লাগল। কাল সব কথা মাকে লিখে জানাব, কেমন?'

বাবা বললে: 'বেশ লিখিস, কিন্তু এখন শুভরাত্রি খোকা, ঢের কাজ আছে কাল। তোকে তো বলেইছি, বৈ.আ.রে বানানো মহা কঠিন কাজ।'
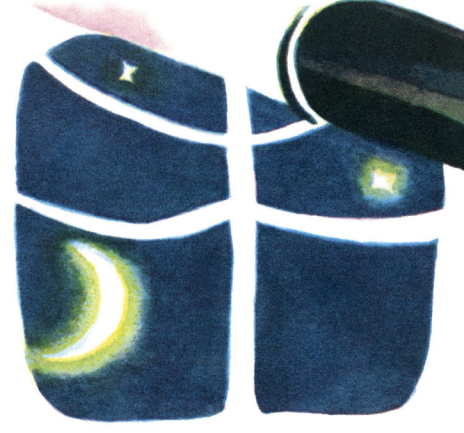
‘কবে ওটা শেষ হবে?’ চোখ বুজতে বুজতে জিজ্ঞেস করল পেতিয়া।

‘তুই বেড়ে ওঠার আগেই রাস্তা পাতা হয়ে যাবে একেবারে মহাসাগর পর্যন্ত... আর তোর ম্যাপটা হারায় নি তো?’

কিন্তু সে কথা কানে গেল না পেতিয়ার। অঘোরে ঘুমচ্ছিল সে। নোটবইয়ের পাতায় আঁকা আমুদে দুই মজাদার লোকের স্বপ্ন দেখছিল সে। একজন বড়ো, আরেকজন ছোটো। হাত ধরাধরি করে তারা সবুজের মধ্যে দিয়ে লাল স্লিপার বরাবর চলেছে মহাসাগরের দিকে, হাসছে আনন্দ করে।

# ক্যামেরা নিয়ে বৈকাল - আমুর রেলপথে!

এরা হল গে তাইগার স্থায়ী বাসিন্দা। মানুষের সঙ্গে ওরা দিন কাটাতে পারবে কি?
'অবশ্যই পারব!' বোধহয় ভাবছে প্যাঁচা আর ভালুক, 'অবিশ্যি আমাদের দু'পেয়ে পড়শীরা যদি আমাদের মনে ঘা না দেয়।'

বৈকাল-আমুর রেলপথে এখনো যারা আছে, দেখা করা যাক তাদের সঙ্গে।
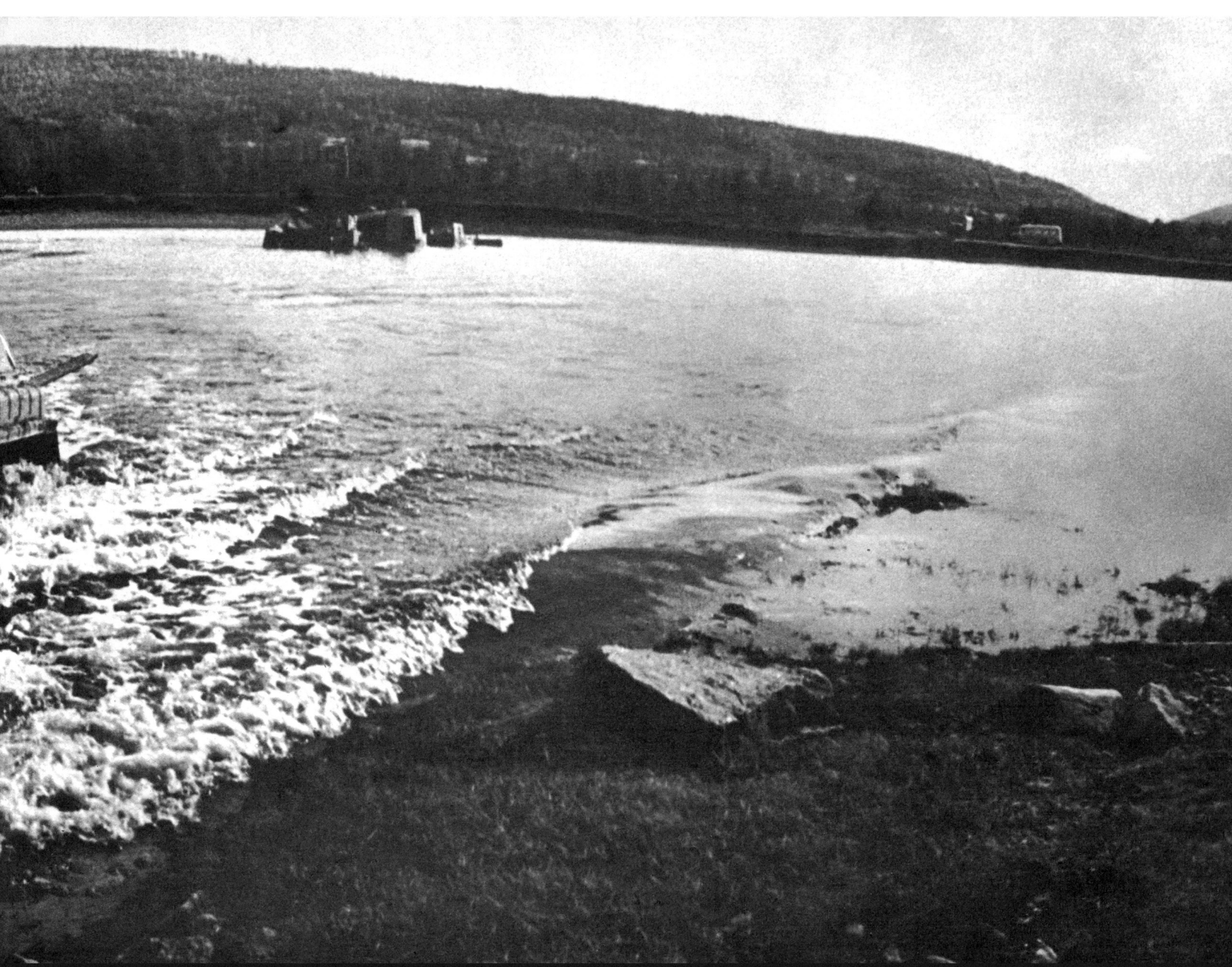
তাইগার নতুন বাসিন্দা, বৈকাল-আমুর রেলপথের নির্মাণকর্মীদের ভাবনা তো আছে: দুর্ভেদ্য অরণ্যে কাটতে হবে পথ, ছোটো-বড়ো নদীর ওপর বাঁধতে হবে সেতু...

এইসব সুন্দর সুন্দর ফুল আর সুস্বাদু বৈঁচিগুলো কি ফলে চিরন্তন হিমের মাটিতে? দ্যাখো কেমন তোমার নিষ্করুণ এলাকা সাইবেরিয়া!
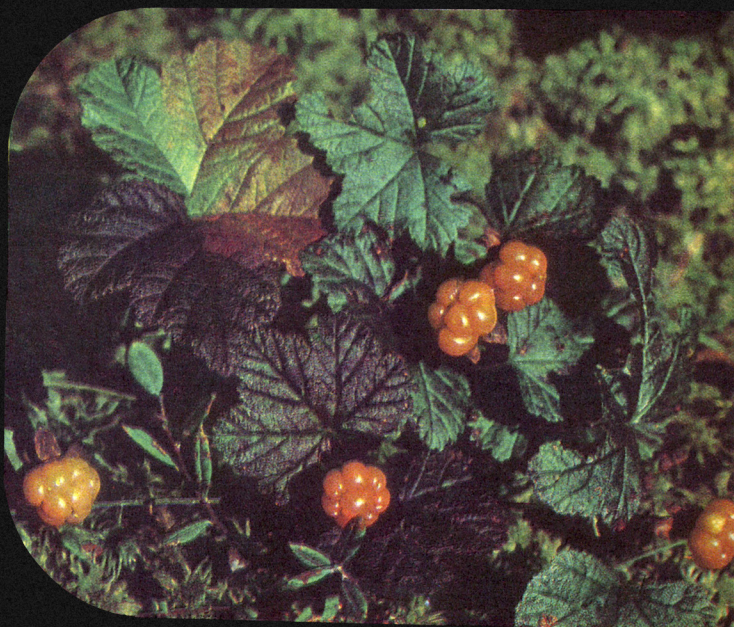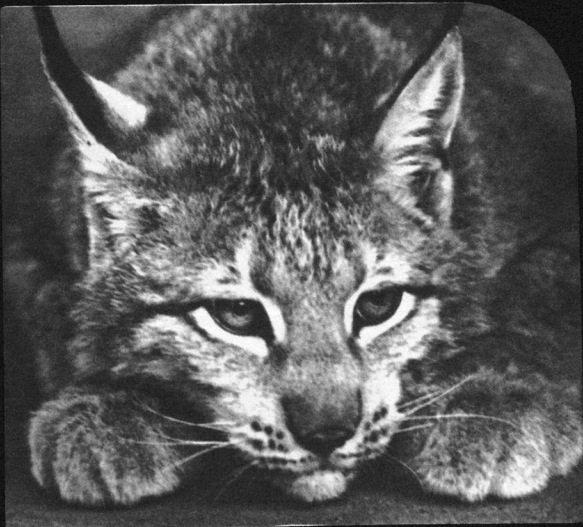
দ্যাখো কেমন বিচিত্র
এখানকার জীবজন্তু!
তোমার দেশে কি হয়
এমন ধারা গিরগিটি,
মেঠো ইঁদুর,
বনবিড়াল, ছাতার
পাখির ছানা,
কাঠবেড়ালি, সজারু,
খরগোশ?

‘কী এটা বিরাট এক ডাঁশ-মাছি নামছে আকাশ থেকে? একটু উঁচুতে উঠে দেখি। কী অদ্ভুত জন্তু, কী ওর দরকার এখানে?’

ভবিষ্যতে এখানে হবে লৌহকর্মী, রসায়নকর্মীদের বিশাল শহর।
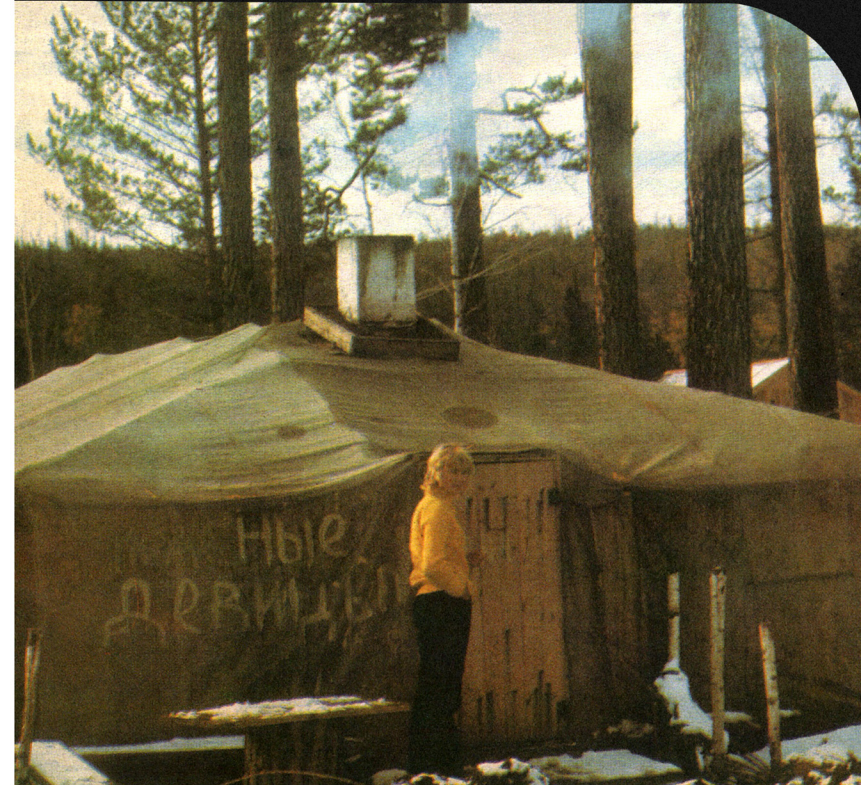
আর  এখন সে নেহাৎ বাচ্চা, সবে জন্মেছে, মাত্র দুটি কয়েক ঘর।

ছিল এক পাহাড়, এখন তা আর নেই!..

খবরদার, নির্মাতাদের পথে বাধা দিও না!

বৈকাল-আমুর রেলপথের রাজধানী তিন্দা শহরের ফুটপাথ কাঠে বানানো। তবে ইশকুলে ঢোকার এমন সুন্দর ফটক বড়ো বড়ো শহরেও তেমন একটা দেখা যাবে না।
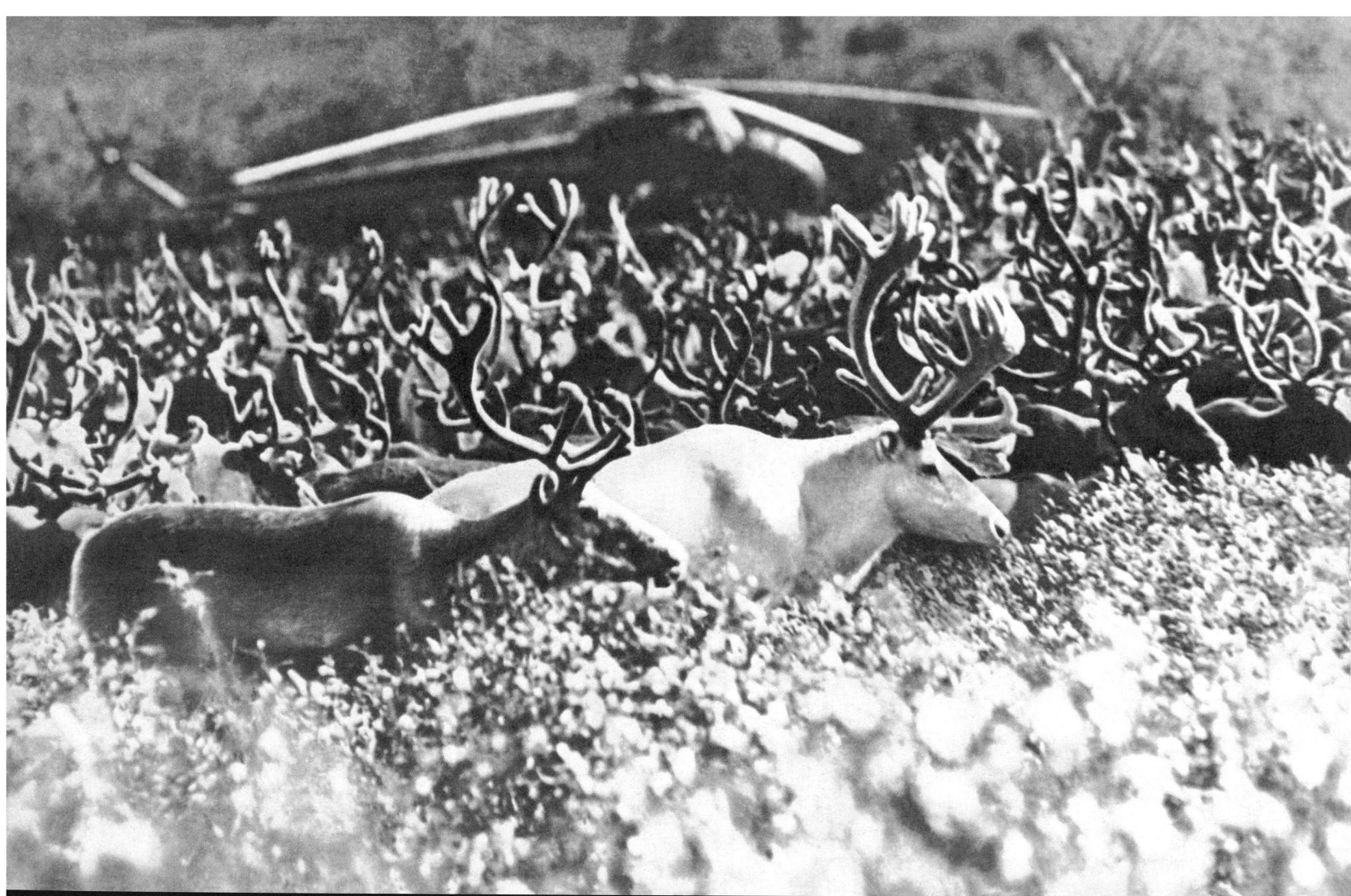
হেলিকপ্টারের খাদ্য পেট্রল, কিন্তু উত্তরী হরিণেরা খায়
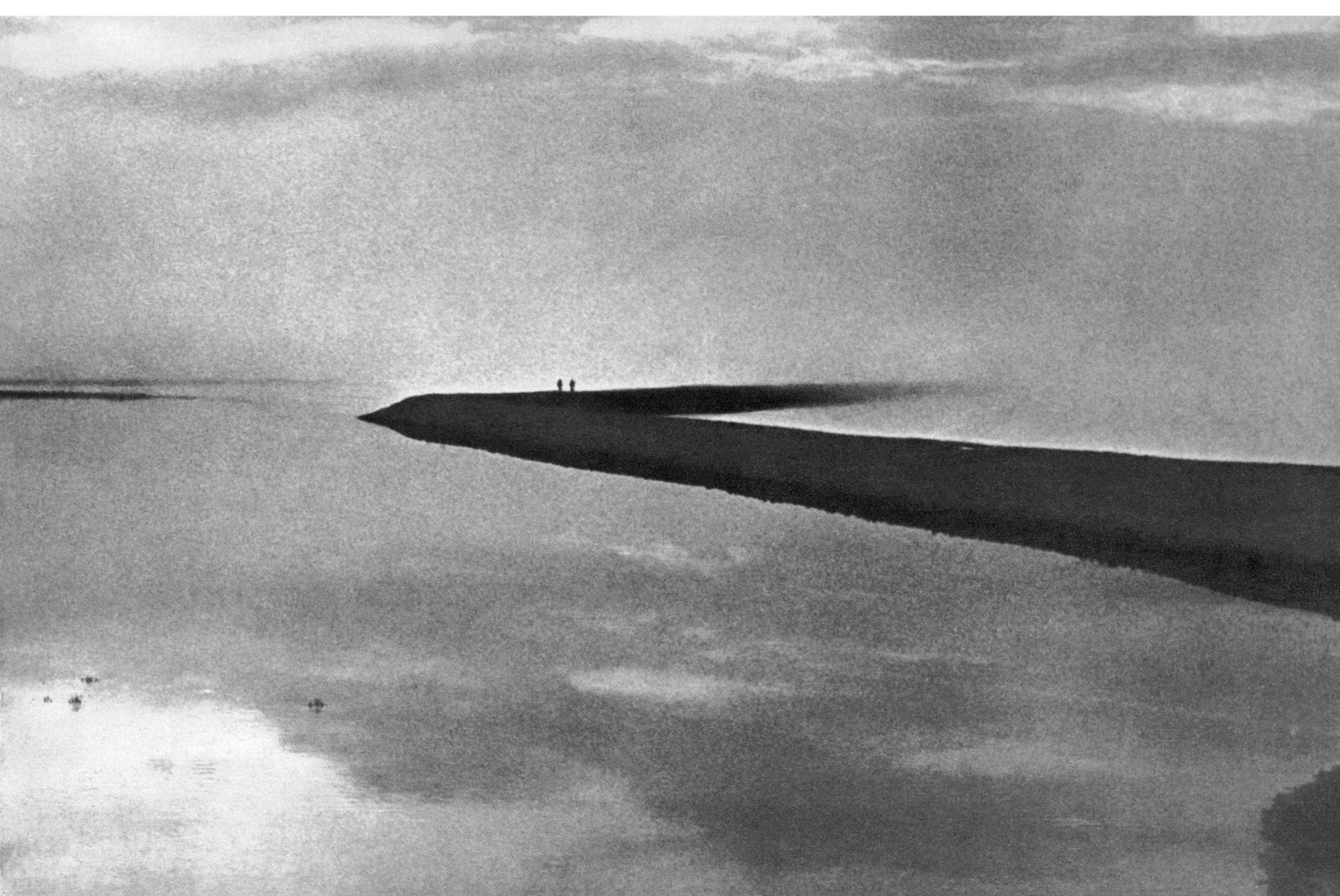
শেওলা, বরফে গজানো তৃণ... যার যেটা পছন্দ আর-কি!

শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ছাড়া শুধু হাতে এমন পথ পাতা যায় না। তবে

যন্ত্রকেও তো চালায় হাতই! যেমন স্বর-পরিচালক চালায় অর্কেস্ট্রা।

বৈকাল-আমুর রেলপথে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাবার জন্যে টানেল খোঁড়া।

এই হল পথের নতুন প্লট। ছিন্নাংশ তার অনেক, অবশ্যই, সেগুলো সমান করে নিতে হবে।

স্লিপার-টিপার সমেত রেলপথের পুরো এক-একটা অংশ পেতে দেয় পথ-পাতার যন্ত্র। তা নইলে সময় লাগত কত!

বৈকাল-আমুর রেলপথ নির্মাতাদের সঙ্গত কারণেই বলা চলে পথিকৃৎ। নিজেদের শ্রম-বিজয় তারা উদ্‌যাপন করে আনন্দঘন শিবিরাগ্নির উৎসবে।

ТЭМ2-1272

**И. Ракша**

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

*на языке бенгали*



P $\frac{70802\text{-}301}{014(01)\text{-}81}$ 761-81

4803010102